আজকের কাগজ ৪৬
তারিখ 26 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাড়ছে জটিলতা যতো বিড়ম্বনা রত্নাদের

আসাদ উল্লাহ

মেয়েটি হতাশ। চোখে-মুখে বেদনার ছাপ। হতাশতো হবেই। এইচএসসি পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারার মতো ট্র্যাজেডি আর কি আছে। মেয়েটি আমার পরিচিত। স্নেহভাজন। নাম তার রত্না। প্রথম বিভাগ পাওয়ার মতো ছাত্রী সে।

হতাশ আমিও। তবে আমার হতাশা আর রত্নার হাতাশার মধ্যে কিছুটা ব্যবধান আছে বৈকি। রত্না হতাশ তার দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে। হতাশ না জানি সে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এই ভয়ে। কে না স্বীকার করবে যে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলই বহন করে উচ্চ শিক্ষার ইঙ্গিত। বহন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা না পারার ইঙ্গিত।

আমি হতাশ শিক্ষা ক্ষেত্রের তাবৎ চালচিত্র দেখে। যুগটা এখন কম্পিউটারের। জীবনের পরতে পরতে 'কম্পিউটারের কমিটমেন্ট'-এ কথা অনস্বীকার্য। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের সময় ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার। কম্পিউটারের গ্যাড়াকলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ। যার প্রথম বিভাগ বা স্টার পাওয়ার কথা সে করছে। ফেল। আবার যার ফেল করার কথা সে পাচ্ছে দ্বিতীয়। প্রথম বিভাগ বা স্টার। না, দোষ কম্পিউটারের নয়। 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'- এ কথা অন্তত আমি বলবো না। দোষ কম্পিউটার চালক, ড্রাইভার বা অপারেটর তাদের। তারা হয় অদক্ষ, না হয় অমনযোগী, দায়িত্ব জ্ঞানহীন। যদি তাই না হবে, তাহলে ফলাফলে ভুল হয় কেনো? কেনো আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আশানুরূপ ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়? কেনো পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ আসে, সমালোচনা হয় শিক্ষার 'ব্যারোমিটার' সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে?

কম্পিউটারের অদক্ষ চালক বা অপারেটরদের সরিয়ে নেয়া উচিত। সরিয়ে নেয়া উচিত অমনযোগী, দায়িত্ব জ্ঞানহীনদের। না হয় উচিত ফলাফল প্রকাশে কম্পিউটারের ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' বহুদিনের পুরনো শ্লোগান। দিন যাচ্ছে, এ শ্লোগান অর্থবহ হয়ে ওঠার পরিবর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। পড়বেই তো। শিক্ষার ওপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তবে ভালোবাসা আছে, আর আছে শ্রদ্ধা। ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা আছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া-লেখা করছে। শিক্ষার প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে, এ কথাও সর্বাংশে ঠিক নয়। আসলে আস্থা হারিয়ে ফেলছে শিক্ষা ক্ষেত্রের যারা ধারক, বাহক তাদের প্রতি।

আস্থা থাকে কি করে। শিক্ষা ক্ষেত্রের ধারক, বাহক, চালকদের সিংহভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষার স্বার্থ নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থ নয়। তারা দেখছেন নিজের স্বার্থ। দেখছেন আর্থিক স্বার্থ, গাড়ি-বাড়ির সুযোগ আসে কোন পথে। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলী অনিয়ম করেছেন। দুর্নীতি করেছেন। চরম। গাড়ি, বাড়ি, ভোগ করছেন অবৈধভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করেছেন স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। নিয়োগে নিজ জেলা যশোরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেখে দেখে নিকটাত্মীয় নিয়েছেন। শুধু তাই নয়। অনেককে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছেন। পালাক্রমে তাদের নিয়োগ জায়েজ করেছেন বিশেষ প্ল্যানে। কি অবাক কাণ্ড! বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান; অথচ বাংলা দেশের সব জেলার লোক এ প্রতিষ্ঠানের চাকরির নিয়োগে, কাজে-কর্মে অংশ নিতে পারবেনা। জনাব আলী চমৎকার দেখালেন। দেখালেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের নয়। যশোরের প্রতিষ্ঠান। যশোর বাংলাদেশের বাইরের অংশ!

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে শিক্ষাক্ষেত্রের এমন কোনো শাখা নেই, স্তর নেই যেখানে চাকরির নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে না। কম-বেশী। গত ৭ নভেম্বর 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিলো, 'মনোহরদী পাইলট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ২ মাসেও তদন্ত হয়নি।' সংবাদে বলা হয়েছে, 'মাস পাঁচেক আগে নরসিংদীর মনোহরদী থানা সদর পাইলট স্কুলের কতিপয় শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি ও কারচুপির অভিযোগ উঠলে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ কমিটির দু'সদস্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় পুনরায় তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগে লিখিত তাগাদা দিয়েছেন। সেও প্রায় দু'মাস পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে নিরবতা পালন করে চলছে। তদন্ত কাজে দীর্ঘসূত্রিতা, রহস্যতা, নিরবতা, গড়িমসি, গাফিলতি আমাদের দেশে একটি মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের উচিত এদিকে নজর-দেয়া। জরুরি ভিত্তিতে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কাজে গড়িমসি নিঃসন্দেহে শিক্ষা সম্প্রসারণের অন্তরায়।

শমসের আলীর দুর্নীতি, অনিয়ম ও তদন্ত করে দেখা হবে। পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে। গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত কতোটুকু হয়েছে কিংবা হবে জানিনা। তবে কিছুটা হয়েছে বৈকি। না হলে দুর্নীতি অনিয়মের 'ডিপোর' মুখ উন্মোচিত হয় কিভাবে? সরকারকে অনুরোধ করবো এ বিষয়ে একশ' ভাগ সজাগ থাকার জন্যে। কারণ, এ দেশের বেশির ভাগ দুর্নীতিই তদন্ত কমিটির আশীর্বাদে সুনীতিতে পরিণত হয়।

শমসের আলী একা নয়। শমসের আলী আছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শমসের আলীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে, মাদ্রাসায়, মক্তবে। শিক্ষার তারা বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছেন। তারা বুদ্ধিজীবীর (?) ভাব ধরে দেশের কথা বলেন। সেমিনারে, সিম্পোজিয়ামে। কিন্তু তাদের বাস্তব চরিত্র ভিন্ন। বাস্তবে তারা দায়িত্ব জ্ঞানহীন, অথবা দায়িত্বের প্রতি উদাসীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। তারা পরীক্ষার ফলাফল [illegible] পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' বহুদিনের পুরনো শ্লোগান। দিন যাচ্ছে, এ শ্লোগান অর্থবহ হয়ে ওঠার পরিবর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। পড়বেই তো। শিক্ষার ওপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তবে ভালোবাসা আছে, আর আছে শ্রদ্ধা। ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা আছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া-লেখা করছে। শিক্ষার প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলছে, এ কথাও সর্বাংশে ঠিক নয়।

বিগত দিনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার নিয়মানুপাতে এবারের পরীক্ষা এগিয়ে দিয়েছেন চারমাসেরও বেশি সময়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা এগিয়ে দেয়ার প্রেক্ষিতে নয়। ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে কেনো আগে-ভাগেই জানান দেয়া হয়নি। কেনো হুট করে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হলো।

ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বেশ কয়েকটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন। স্মারকলিপি দিয়েছেন। উল্লেখ করেছেন তাদের সিলেবাস শেষ হয়নি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তারা অভিযোগ করেছেন পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হঠকারিতার সামিল। বিভিন্ন কারণে বছরের বেশির ভাগ সময় কলেজগুলো বন্ধ থাকে। সর্বোপরি শিক্ষক স্বল্পতা। বিজ্ঞানাগারে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব। এমনি অবস্থায় নির্ধারিত সময়েই সিলেবাস শেষ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তার ওপর চারমাসেরও বেশি সময় এগিয়ে পরীক্ষা নিলে সিলেবাস শেষ হবেনা- এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ, তারা পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবেন-এই ভয়ে।

সরকার সেশন জট নিরসন ও উচ্চ শিক্ষার পথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মাণ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের আঁতুড় ঘরে আমরা একথাই শুনেছি। কিন্তু এখন চিত্র দেখছি ভিন্ন। উচ্চশিক্ষার পথ সম্প্রসারণতো দূরের কথা, যেটুকু ছিলো তাও সংকুচিত করেছেন। উ... হারে।

কলেজগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিলো। এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বাংলাদেশের সবক'টি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো... অধীনে যখন ছিলো তখন ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত যা নেয়ার তা ঐ ... কর্তৃপক্ষই নিতেন। এখন যে সুযোগ নেই। কলেজগুলোর পায়ে এখন শিকল। শিকল দিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তারা যদি বলেন দশজন, তা দশজনই। দু'শজন ছাত্র-ছাত্রীকে জায়গা দেয়ার ক্ষমতা কলেজের থাকলেও কিছু করার নেই। দশজন নিয়েই ক্লাস করতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে। বিভিন্ন [illegible] শিক্ষকরাও যাচ্ছেন। যাচ্ছেন ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে।

বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। যে কোনো সময়। ঘটা স্বাভাবিক। কলেজগুলোর আবেদন অগ্রাহ্য করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ যদি দু'শ আসন চায়, যদি বলে আমরা দু'শ ছাত্র-ছাত্রীকে জায়গা দিতে পারবো; দিতে পারবো পড়াশোনার নিশ্চয়তা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত না করে বলে দিবেন, নির্দেশ দিবেন ৩০ জন বা ৪০ জন ভর্তি করাতে হবে। এর বেশি করলে আমরা রেজিঃ কার্ড দেবোনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ নীতিতো নিঃসন্দেহে স্বৈরতান্ত্রিক।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিকনীতি নিঃসন্দেহে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়ার পায়তারা। সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামের হাতিয়ারে সেই কাজটি করতে চাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়। সচেতন ছাত্র-ছাত্রী তা বরদাস্ত করবে কেনো? করবেনা। আলামত বুঝা যাচ্ছে। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ইতি মধ্যেই মিছিল করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিক্ষোভ করছে অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও। কয়েকদিন আগে 'আজকের কাগজের' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিলো, "রাজবাড়ীর পাংশা কলেজে মাষ্টার্সে ভর্তির আসন সংখ্যা হ্রাস প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ। অধ্যক্ষের কক্ষে তালা।' সংবাদে উল্লেখ ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষে পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলায় ৩০টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৬০টি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৬০টি আসন বরাদ্দ দেয়া হয়। ফলে '৯৩-৯৪ শিক্ষা বর্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। কিন্তু দেশে ক্রমাগত ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পাওয়ার পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি না করে উপরন্ত এক আদেশে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তির আসন সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ আদেশে পাংশা কলেজে বাংলায় ২০টি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৩০টি এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগে ৩০টি আসন বরাদ্ধ দেয়া হয়।" পাংশা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ আদেশের প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ করেছে। অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়েছে। অধ্যক্ষ বলেছেন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া কোনোক্রমেই ভর্তি সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

কেবল ভর্তি সমস্যা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিটি সমস্যা, সংকট নিরসনের জন্যে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। এক্ষুণি। শিক্ষাক্ষেত্রের যারা নীতিনির্ধারক তাদের উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করা। উচিৎ ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাকে অনুভব করা। তা না হলে রত্নাদের বিড়ম্বনা বাড়বে। ধ্বংস হবে রত্নাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জীবন। ওরা নিমজ্জিত হয়ে পড়বে হতাশায়।

ক্ষতি দেশেরও কিছুটা হবে। হতাশাগ্রস্ত তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী কেবল নিজেই নিজের সমস্যা নয়; দেশ সমাজেরও সমস্যা বৈ-কি। হতাশা থেকেই জন্ম নেয় বিভ্রান্তির। বিভ্রান্তরা পথ চলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকল্যাণ, অমঙ্গল, অশিব অসুন্দরের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।

আসাদ উল্লাহ: কলাম লেখক।